ডমরুডিহির ভূত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক | বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রাণ সৃষ্টির জন্য হন্যে হচ্ছেন। অথচ প্রকৃতিতে কী অনায়াসে সবসময় প্রাণ সৃষ্টি হয়ে চলেছে।-বলে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নিভে যাওয়া চুরুটটি ধরালেন। তারপর সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। এটা ওঁর চিন্তা-ভাবনার লক্ষণ। আর মুখটাও বেশ গম্ভীর।

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম-হঠাৎ প্রাণ নিয়ে মাথাব্যথার কারণ কী জানতে পারি?

–একটুকরো কাঠ জয়ন্ত! ছোট্ট একটুকরো কাঠ!

সোফার শেষপ্রান্তে হেলান দিয়ে বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার—আমাদের প্রিয় হালদারমশাই খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তড়াক করে সোজা হয়ে বললেন, কাঠ দিয়া মার্ডার?

কে কারে মারল?

বুঝলুম ডিটেকটিভ ভদ্রলোক প্রাণ এবং একটুকরো কাঠ এই দুটি কথা শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। চৌত্রিশ বছর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে চাকরির পর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খোলা এবং রহস্যের খোঁজে ছোঁকছোঁক করে বেড়ানো তাঁর পক্ষে অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। আজ সকালে কর্নেলের ড্রয়িং রুমে তার আবির্ভাব দেখে আশা করেছিলুম নিশ্চয়ই কোনও রহস্যময় কেস হাতে পেয়েছেন এবং শলাপরামর্শের জন্য কর্নেলের সাহায্য নিতে এসেছেন।

কিন্তু প্রায় একঘণ্টা কেটে গেছে এবং ষষ্ঠীচরণের তৈরি স্পেশাল কফি শেষ করে খবরের কাগজে ডুবে গেছেন। তত বেশি নস্যিও নেননি। কাজেই বুঝতে পেরেছিলুম, ওঁর হাতে কোনও কেস নেই।

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ ওঁর কথায় কান না দিয়ে বললেন, আমার ছাদের বাগানে অনেকদিন থেকে ওই কাঠের টুকরোটা পড়ে ছিল। বর্ষা এবং এই শরৎকালের সব বৃষ্টি খেয়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। কাল ভোরে গিয়ে দেখি, ওতে কয়েকটা খুদে ছত্রাক গজিয়েছে। আশ্চর্য! আজ গিয়ে দেখলুম, ছত্রাকগুলো ইঞ্চিটাক চওড়া হয়েছে। তারপর হঠাৎ কোথা থেকে একটা প্রজাপতি এসে ছত্রাকে বসে পড়ল। প্রাণ টেনে এনেছে প্রাণকে। সত্যি জয়ন্ত! প্রকৃতিতে এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। খুবই রহস্যময়। হালদারমশাই হেসে উঠলেন, -গ্রামাঞ্চলে ওগুলিরে ব্যাঙের ছাতা কয়।

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন, —কথাটা লাগসই। কুনো ব্যাঙেরা ঠাণ্ডা সঁতসেঁতে জায়গায় থাকতে ভালবাসে। কারণ বেচারারা গরম সহ্য করতে পারে না। তবে প্রজাপতিরাও ছত্রাক ভালবাসে। ছত্রাক তাদের খাদ্যও বটে।

বললুম, —কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনার এত চিন্তার কারণ কী?

হালদারমশাই কাঠ দিয়ে মার্ডার করার কথা বললেন, এটাও চিন্তাযোগ্য। এক টুকরো কাঠ প্রাণকে যেমন ধ্বংস করতে পারে, তেমনই প্রাণ সৃষ্টি করতেও পারে। ধন্যবাদ হালদারমশাই! আপনি একটা চমৎকার খেই ধরিয়ে দিয়েছেন।—বলে কর্নেল চোখ বুজে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন।

প্রাইভেটে ডিটেকটিভ কর্নেলের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার পর আমার দিকে ঘুরলেন। তাঁর চোখে প্রশ্ন ছিল। আমি তাকে কিছুই জানি না বোঝাতে একটা ভঙ্গি করলুম। কিন্তু তার দৃষ্টিতে সন্দেহের চিহ্ন থেকেই গেল। একটিপ নস্যি নিয়ে তিনি একটু ইতস্তত করে আস্তে ডাকলেন, –কর্নেলসার!

-বলুন হালদারমশাই!

–আমার একটু খটকা বাধছে। কর্নেল কী বলতে যাচ্ছেন, এমনসময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। একটু পরে ষষ্ঠী এসে বলল, —যমের দিঘি থেকে একটা লোক এয়েছে বাবামশাই।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, —যমের দিঘি?

ষষ্ঠী কাঁচুমাচু মুখে বলল, -শুনে তা-ই তো মনে হল। পেল্লায় লোক বাবামশাই! কালো কুচকুচে গায়ের রং। চুল গোঁফ বেজায় সাদা।

—নিয়ে আয়।....

ষষ্ঠী ঠিকই বলেছিল। পেল্লায় লোকের বদলে কালো দৈত্য বললেই ঠিক হয়। ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে আঁকা মূর্তির মতো। পরনে খাটো করে পরা ধুতি আর হাফহাতা ফতুয়া। পায়ে যেমনতেমন চপ্পল। কাঁধ থেকে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। কর্নেলকে করজোড়ে প্রণাম করে সে বলল,

—চিনতে পারছেন তো সার? আমি ডমরুডিহি রাজবাড়ির সেই রাঘব।

কর্নেল বললেন, —তোমাকে না চেনার কোনও কারণ নেই রাঘব! বোসো। তারপর বল কী খবর। কুমারসায়েব কেমন আছেন?

রাঘব বলল, —বসব না সার, ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। কুমারসায়েবের শরীর ভাল না। ভবানীপুরে মেয়েকে খবর পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকেই আসছি। কুমারসায়েব আপনাকে এই চিঠিটা দিয়ে আসতে বলেছেন। বলে সে ফতুয়ার ভেতরপকেট থেকে একটা খাম বের করে কর্নেলকে দিল। কর্নেল খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠি বের করলেন। তারপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, তোমার ট্রেন কটায়?

—আজ্ঞে সওয়া বারোটায় ছাড়ার কথা। কিন্তু কলকাতার যা অবস্থা দেখলাম! ট্রাম-বাসের ভরসা না করে হেঁটেই যাব।

–কুমারসায়েবের মেয়ে-জামাই কি ডমরুডিহি যাচ্ছেন?

—জামাইবাবু খুব ব্যস্ত। আজ দিল্লি তো কাল বোম্বাই। পরে যাবেন বললেন। আর দিদিমণি যাবেন কাল ভোরের ট্রেনে। আমাকে থাকতে বলছিলেন। কিন্তু আমি থাকি কী করে বলুন? কাল সন্ধেবেলায় এসেছি। কুমারসাবের দেখাশুনোর ভার দিয়ে এসেছি গদাইকে। তাকে তো ভালই চেনেন সার। গাঁজাগুলি খেয়ে সবসময় চুলে বেড়ায়। তবে ওর বউটাই যা ভরসা। রান্নাবান্না সেবাযত্ন—আচ্ছা, চলি সার!

আবার একটু ঝুঁকে করজোড়ে কর্নেলকে প্রণাম করে কালো দৈত্যটি বেরিয়ে গেল।

হালদারমশাই হাসলেন, -ষষ্ঠী ঠিক কইছিল। যমের দিঘির যমই বটে।

বললুম, —ডমরুডিহি! অদ্ভুত নাম তো!

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, -ওখানে অবিকল ডমরুর মতো গড়নের একটা পাহাড় আছে। তবে ডমরুর সঙ্গে শিবের সম্পর্ক থাকায় রাজবাড়ির শিবমন্দিরের খুব নামডাক। পাহাড়টার নামও ডমরুপাহাড়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, ডমরুপাহাড়ে শিবের চেলাদের বাস। তাই পারতপক্ষে দিনদুপুরেও কেউ একা ওদিকে পা বাড়ায় না।

—শিবের চেলা মানে ভূতপ্রেত?

—তা ছাড়া আর কী?

হালদারমশাই বললেন,–আপনি দেখছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, —দেখিনি। তবে ডমরুপাহাড় থেকে সন্ধ্যাবেলায় নেমে আসার সময় অদ্ভুত একটা কান্না শুনেছিলুম। কারা যেন আহা-উহু করে কেঁদে বেড়াচ্ছিল।

ভূতেরা কান্দে ক্যান?—বলে অন্যমনস্কভাবে হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিলেন।

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন, —ডমরুপাহাড়ে ভূতের ওই অদ্ভুত কান্না প্রথমে কুমারসায়েব শুনেছিলেন। গত অক্টোবরে আমি তার ডাকেই ডমরুডিহি গিয়েছিলুম। কিন্তু প্রায় একসপ্তাহ কাটিয়ে সেই রহস্যের সমাধান করতে পারিনি। কুমারসায়েব এই চিঠিতে লিখেছেন, সম্প্রতি সেই ভূতেরা রাজবাড়িতে এসে রাতবিরেতে কান্নাকাটি করে বেড়াচ্ছে। তার মানে পাহাড় থেকে ওরা এবার নেমে এসেছে। এই উৎপাতে নাকি কুমারসায়েব ঘুমোতে পারছেন না। অস্থির হয়ে উঠেছেন। চিন্তা করুন হালদারমশাই! কুমারসায়েবের বয়স আমার চেয়ে দু-তিন বছর বেশি। অবশ্য এখনও শক্তসমর্থ মানুষ। কিন্তু রাতের পর রাত ওইরকম উৎপাত হলে কী অবস্থা হয়!

লক্ষ করলুম উত্তেজনায় প্রাইভেট ডিটেকটিভের গোঁফ তিরতির করে কাঁপছে। বললেন, —আপনি কইলে আমি ভূতগুলিরে জব্দ করতে পারি।

হাসতে হাসতে বললুম, —আপনি ভূত জব্দ করার মন্ত্র জানেন তাহলে?

কী যে কন?—হালদারমশাই চটে গেলেন। চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। রাত্রে কত শ্মশান-মশান বনবাদাড়ে—হঃ! ভূত না। বজ্জাত লোকের কাজ। কর্নেলসার! আপনি যদি যান আমারে সঙ্গে লইবেন।

কর্নেল গম্ভীরমুখেই বললেন, আপনি বরং আগেই চলে যান। হাওড়া-গয়া প্যাসেঞ্জারে আসানসোল হয়ে ডমরুডিহি। ওখানে অনেক হোটেল আছে। একটা সুন্দর লেক আছে। চমৎকার টুরিস্ট স্পট।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সটান উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন, —ওই কালো লোকটা—কী য্যান নাম?

–রাঘব।

-রাঘবেরে ফলো করব।

—হালদারমশাই! রাঘবের সঙ্গে যেন ঝামেলা বাধাবেন না। ওই তল্লাটে ওকে সবাই সমীহ করে চলে। ওর গায়ে সত্যিই দৈত্যের মতো জোর।

হালদারমশাই গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে কথাগুলি শুনলেন। তারপর সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

বললুম, —হালদারমশাইকে লড়িয়ে দিলেন। দেখবেন, ঠিকই ঝামেলা বাড়বে।

কর্নেল হাসলেন, তুমি ওঁকে বরাবর তুচ্ছ কর জয়ন্ত! কিন্তু কত সময় ওঁর পুলিশ জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে কতটা সাহায্য করেছে, তা তোমার মনে রাখা উচিত। প্রয়োজনে উনি যে সব কাজ করতে পারেন, আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়।

হেসে ফেললুম, —যেমন ছদ্মবেশ ধরা।

—হাঃ। পুলিশের গোয়েন্দারা ছদ্মবেশ ধরতে পটু। হালদারমশাইয়ের এ ব্যাপারে রীতিমতো ট্রেনিং আছে। বিশেষ করে সাধুসন্ন্যাসীদের খুব সম্মান করে ললাকে।

—ঠিক বলেছেন। তা আপনি কবে যমের দিঘি—সরি! ডমরুডিহি যাচ্ছেন? কর্নেল হো হো করে হেসে উঠলেন, তুমি আমাকে যমের দিঘিতে একা পাঠাতে চাও? না জয়ন্ত! তোমাকেও নিয়ে যাব।

কর্নেল ইজিচেয়ারে আবার হেলান দিলেন। আমি ওঁর দিকে উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে রইলুম। ভূতপ্রেত থাক বা না থাক, ওঁর সঙ্গে কোথাও যাওয়া মানেই পাহাড়জঙ্গলে ঘোরাঘুরি। এ বয়সে পারেনও বটে!...

দুই

ডমরুডিহির রাজবাড়ি দেখে হতাশ হয়েছিলুম। দুধারে ধ্বংস্তুপ আর যাচ্ছেতাই রকমের জঙ্গল। মধ্যিখানে একফালি সংকীর্ণ পাথরের ইটে বাঁধানো পথ। পথের শেষপ্রান্তে কোনও রকমে টিকে থাকা একটা দোতলা পুরনো বাড়ি। একপাশে তেমনই পুরনো একটা শিবমন্দির। পেছনে উঁচু পাহাড়। পাহাড়টার গড়ন কতকটা ডমরুর মতো। মাঝখানে উচ্চতা কম এবং দুদিকে ভাগ করা বোঝা যাচ্ছিল, অতীতে এই বাড়িটা রীতিমতো একটা দুর্গপ্রাসাদ ছিল।

রাঘব আমাদের দেখতে পেয়ে দোতলা থেকে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছিল। সে চাপা গলায় বলেছিল, —দিদিমণি কাল সন্ধ্যায় এসেছেন। কুমারসায়েবকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। কিন্তু উনি এখান থেকে নড়বেন না। এই নিয়ে বাবা-মেয়ের মধ্যে খুব তর্কাতর্কি হচ্ছে।

সে আমাদের নিচের একটা ঘরে বসিয়ে রেখে কুমারসায়েবকে খবর দিতে গিয়েছিল। ঘরটার আসবাব পুরনো হলেও আভিজাত্যের চিহ্ন প্রকট। দেয়ালে ঝোলানো পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্র, কিছু ব্রোঞ্জ আর পাথরের ভাস্কর্য, চিনেমাটির কারুকার্য-করা প্রকাণ্ড ফুলদানি এবং একটা ঝাড়বাতিও চোখে পড়ল। মাথার ওপর সিলিংফ্যান দেখে বুঝলুম, এ বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে।

একটু পরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কুমারসায়েব নেমে এলেন। শক্তসমর্থ গড়নের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। পরনে সাদাসিধে ধুতি-পাঞ্জাবি। হাতে একটা মোটাসোটা ছড়ি। চেহারায় বনেদি ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার পর আমার দিকে হাত বাড়ালেন।

কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিলেন, কুমারসায়েব! আমার এই তরুণ বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরির কথা আপনাকে বলেছিলুম। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক!.... আর জয়ন্ত! ইনি ডমরুডিহি রাজপরিবারের একমাত্র বংশধর কুমার ধ্রুবনারায়ণ রায়।

রাঘব এসে দাঁড়িয়ে ছিল। কুমারসায়েব তাকে বললেন, -কর্নেলসায়েবের থাকার জন্য কোন ঘরের ব্যবস্থা করেছ?

রাঘব বলল, -গতবার যে ঘরে উনি ছিলেন।

—চলুন কর্নেলসায়েব। আর রাঘব! তুমি গিয়ে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করো।

কর্নেল বললেন, আমরা স্টেশনেই ওটা সেরে নিয়েছি কুমারসায়েব! আপাতত শুধু কফি!

পূর্ব-দক্ষিণ কোণের একটা ঘরে গিয়ে বুঝলুম, এই বাড়িটা উঁচু জায়গায় অবস্থিত। দক্ষিণে ভাঙাচোরা পাঁচিলের নিচে বিশাল জলাশয়। ওটাই তা হলে সেই লেক। পূর্বদিকে সানবাঁধানো একটা প্রশস্ত চত্বরের পর শিবমন্দির। মন্দিরের তিনদিকে ঘন জঙ্গল আর ধ্বংসস্তুপ।

আমাদের বসতে বলে কুমারসায়েব দক্ষিণের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। উঁকি মেরে কিছু দেখে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, —কাল থেকে একটা সন্দেহজনক ব্যাপার লক্ষ্য করছি। একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এদিকটায় উকিঝুঁকি মেরে বেড়াচ্ছে। রাঘবকে পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু তেমন কাউকে খুঁজে পায়নি। অথচ আমি স্পষ্ট দেখেছি।

কর্নেল বললেন, —ও নিয়ে আপনার চিন্তার কারণ নেই। আপনি বরং রাতবিরেতে ভূতুড়ে কান্নার ঘটনাটা বলুন।

কুমারসায়েব একটা চেয়ারে বসে বললেন, —আট-দশদিন ধরে এটা ঘটছে। আপনি জানেন, আমি দোতলায় দক্ষিণে-পশ্চিম কোণের ঘরে থাকি। প্রতি রাত্রে যখন-তখন জানালার নিচে ওই অদ্ভুত কান্নার উৎপাত। খেপে গিয়ে বন্দক ছুড়েছি। রাঘব টর্চ-বল্লম নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি।

কালও সারারাত মাঝেমাঝে ওই উপদ্রব। রাঘব প্রথম প্রথম রাত জেগে টহল দিত। আমিই বারণ করলুম। কর্নেলসায়েবকে খবর দেওয়া যাক। কারণ আমার ধারণা, এর পেছনে একটা দুষ্টচক্র আছে। আপনি ভালই জানেন, ভূতপ্রেত আমি মানি না।

—আপনার মেয়ের আসার কথা ছিল। সে কি এসেছে?

–রানু কাল বিকেলের ট্রেনে এসেছে। সে-ও বলেছে, কোনও বজ্জাত দলবল নিয়ে ভূতের ভয় দেখিয়ে আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়াতে চায়। কিন্তু পূর্বপুরুষের এই ভিটে ছেড়ে কোথাও গিয়ে তো আমি শান্তি পাব না। তা ছাড়া আমি এখান থেকে চলে গেলে জয়গোপালের পোয়াবারো। বাড়ি দখল করে ফেলবে।

—জয়গোপালবাবু তো কলকাতায় থাকেন।

কুমারসায়েব বাঁকা হেসে বললেন, —ওটা ওর চালাকি। এখানকার বাড়িতে একজন কেয়ারটেকার রেখেছে। লোকদেখানো ব্যাপার মাত্র। প্রায়ই সে এখানে এসে থাকে। আপনাকে বলেছিলুম, এই এলাকার যত খুনে ডাকু গুণ্ডা বদমাশ সব্বাই ওর চেলা।

রাঘব একটা ট্রেতে কফি স্ন্যাক্স এনে টেবিলে রাখল। একটু হেসে সে বলল, —গদাই সেই সাধুবাবাকে দেখে এসেছে কুমারসায়েব! ঝিলের ধারে শ্মশানতলায় ধুনি জ্বেলে বসে আছেন। কজন চেলাও জুটে গেছে। গদাইয়ের কথা শুনে মনে হল সে-ও চেলা হয়ে গেছে।

কুমারসায়েব হাসলেন, —যতসব গাঁজাখোরের কাণ্ড! তুমি রাণুকে পাঠিয়ে দাও। কর্নেল সায়েবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

রাঘব চলে গেলে কর্নেল বললেন, —জয়গোপালবাবুর সঙ্গে আপনার মামলা চলছিল, কী হল শেষ পর্যন্ত?

—হাইকোর্টে হেরে ভূত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে যাবে শুনেছিলুম। যায়নি। গিয়ে লাভ হত না। আমরা ভাইবোন দুজনেই সেই পঁচিশ একর পোড়া জমি একটা আশ্রমকে দান করেছিলুম। জয়গোপালের যুক্তি হল, সে তখন নাবালক ছিল। তার মাকে আমি নাকি বোকা বানিয়ে—হুঁ! এ যুক্তি ধোপে টেকে?

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, জয়গোপাল নামে এক ভদ্রলোক কুমারসায়েবের ভাগ্নে। তার মানে, মামা-ভাগ্নের বিবাদ। বললুম, —আচ্ছা কুমারসায়েব, ভূতুড়ে উৎপাতের কথা পুলিশকে জানিয়েছেন কি?

আপনার মাথাখারাপ? —কুমারসায়েব বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি জয়গোপালকে চেনেন। পুলিসের তাবড় তাবড় কর্তা থেকে শুরু করে নেতা, এমনকী মন্ত্রীদের সঙ্গে ওর খুব খাতির। ডমরুডিহি এলাকায় অনেক খনি আছে। জয়গোপাল একসময় খনিশ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি করত। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হয়েছিল। শেষে ইউনিয়নের মধ্যে দলাদলি মারপিট শুরু হয়ে গেল। ফণীশ্বর সিং নামে আরেক নেতা জয়গোপালকে ঢিট করে দিল। ফণীশ্বরের ভয়ে সে আর ডমরুপাহাড়ের পশ্চিমে পা বাড়ায় না।

—ওদিকেই খনি এলাকা?

—হ্যাঁ। কর্নেলসায়েব গতবারে আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। এবার কর্নেলসায়েবের সঙ্গে আপনি যেতে পারেন। কাগজে লেখার মতো অনেক কিছু পেয়ে যাবেন।

রাঘব এসে বলল, -দিদিমণি ঝিলের ঘাটে চান করতে গেছে।

কুমারসায়েব আঁতকে উঠে বললেন, —সর্বনাশ! ঝিলের জল এখন বেজায় ঠাণ্ডা। জ্বরজ্বালা হতে পারে। চামেলী ওকে বারণ করেনি?

—ছোটবেলার অভ্যেস। যখনই আসে, তখনই তো ঝিলে সাঁতার কাটতে নামে দিদিমণি!

কুমারসায়েব হাসলেন, কলকাতার লেক পেয়েছে! ও রাঘব! তুমি একটু লক্ষ্য রেখ। বেশিক্ষণ যেন জলে না থাকে।

রাঘব চলে গেলে কর্নেল বললেন, -তা হলে ভূতুড়ে কান্নাটা ডমরুপাহাড় থেকে নেমে এসেছে?

কুমারসায়েব গম্ভীর হয়ে বললেন, -কান্নার সুরটাও বদলেছে। আগে ছিল শুধু আহা হা হা! উ হু হু হু! এখন ঘনঘন আহাঃ উহুঃ! শুনলে সত্যি বুক ধড়াস করে ওঠে। গতবার আপনি নিজের কানে শুনতে পেয়েছিলেন। এবার শুনলে তফাতটা বুঝতে পারবেন। যাই হোক, আপনারা বিশ্রাম করুন, আজকাল ট্রেনজার্নির যা অবস্থা!

কর্নেল বললেন, —আমরা দিব্যি ঘুমিয়ে এসেছি। এখন একটু বেরোতে চাই।

প্রজাপতি ধরতে নাকি পাখি দেখতে?—কুমারসায়েব সকৌতুকে বললেন, বেশি দেরি করবেন যেন। একসঙ্গে খেতে বসব। আপনারা না ফিরলে আমি উপোস করে থাকব।

এখন প্রায় দশটা বাজে। সাড়ে বারোটার মধ্যেই ফিরে আসব।-বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওঁকে অনুসরণ করতে হল। ট্রেনে আমার ভাল ঘুম হয়নি। তা ছাড়া এই খামখেয়ালি সঙ্গীর পাল্লায় পড়ে পাহাড়-পর্বত বনবাদাড়ে কতক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে হবে কে জানে?

বেরিয়ে গিয়ে বললুম, —পাখি-প্রজাপতির পেছনে আমি কিন্তু ছুটছি না কর্নেল!

-নাহ জয়ন্ত! আমরা আপাতত শ্মশানতলায় যাচ্ছি।

–তার মানে সেই সাধুবাবার কাছে? কিন্তু কর্নেল উনি যদি—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন, উনি হালদারমশাই ছাড়া আর কে?

—যদি হালদারমশাই না হয়ে সত্যি-সত্যি কোনও সাধুবাবা হন?

কর্নেল হাসলেন, —তাতে কোনও অসুবিধে নেই। সাধুসঙ্গ করলে পুণ্য হয়।

—আচ্ছা কর্নেল, কুমারসায়েবের মধ্যে সায়েবি কিছু তো দেখলুম না। একেবারে দিশি ভদ্রলোক।

—একসময় পুরোদস্তুর সায়েব ছিলেন। ঘোড়ায় চেপে বেড়াতেন। শিকারে যেতেন। সেইজন্য ওঁকে সবাই কুমারসায়েব বলত।

কর্নেল হঠাৎ-হঠাৎ থেমে গিয়ে অভ্যাসমতো বাইনোকুলারে চোখ রেখে সম্ভবত পাখি-টাখি দেখছিলেন। রাজবাড়ির ভেঙেপড়া ফটকের কাছে পৌঁছেছি, সেইসময় ডানদিকে ধ্বংসস্তূপ-ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে কেউ চাপাগলায় ডাকল, কর্নেল সার! জয়ন্তবাবু!

চমকে উঠেছিলাম। ঘুরে দেখি, ছদ্মবেশী প্রাইভেট ডিটেকটিভ উঁকি দিচ্ছেন। মাথায় প্রকাণ্ড জটাজুট, মুখে তেমনই দাড়ি-গোঁফ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কর্নেল দ্রুত চারপাশ দেখে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। বললেন, আপনার কাছে শ্মশানতলায় যাচ্ছিলুম।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক করুণমুখে বললেন, —থাকতে দিল না। খালি ঢিল ছোড়ে। শেষে একখান পাথর আইয়া পড়ল।

—তাহলে বোঝা যাচ্ছে, শ্মশানতলায় আপনি থাকুন এটা কেউ বা কারা চায় না।

—নাকি আমারে চিনছে?

কর্নেল হাসলেন, -আপনাকে চিনবে কী ভাবে? যাই হোক, কাল রাতের খবর বলুন!

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন, —ব্যাটম্যান! এক্কেরে ব্যাটম্যান। শিবমন্দিরের পিছনে লুকাইয়া গেল। মুখে আহাঃ উহুঃ সাউন্ড। মানুষ না কর্নেলসার। কোনও জন্তু।

কর্নেল বললেন, আপনি ছদ্মবেশ ছেড়ে লেকে স্নান করে ফেলুন। তারপর পোশাক বদলে নিন। আমরা ততক্ষণ আপনার জন্য অপেক্ষা করছি এখানে।.....

তিন|

হালদারমশাইয়ের বগলদাবা গেরুয়া কাপড়ের পুটুলি দেখছিলুম। সম্ভবত ওটার ভেতরে একপ্রস্থ পোশাক ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি প্যান্টশার্ট জুতো পরে এসে গেলেন। কাঁধে ঝোলানো মোটাসোটা কিট ব্যাগ দেখে বুঝলুম, নকল জটাজুট গোঁফদাড়ি কৌপিন ইত্যাদি এখন ওর ভেতর ঢুকে গেছে। তিনি কাচুমাচু হেসে বলেন, ত্রিশূল ফ্যালাইয়া আইছি।

কর্নেল বললেন, আপনার ত্রিশূল কেউ নেবে বলে মনে হয় না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনি এত নিশ্চিত হলেন কী ভাবে?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। হালদারমশাইকে গতরাতের ঘটনা সম্পর্কে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে ব্যস্ত হলেন। হালদারমশাইয়ের কথা থেকে জানা গেল, উনি গত পরশু রাত আটটা নাগাদ এখানে পৌঁছন। স্টেশনের ভিড়ে রাঘবকে হারিয়ে ফেলেন। অগত্যা স্টেশনের কাছাকাছি একটা হোটেলে ওঠেন। সেখানে খাওয়াদাওয়া করে উনি একটা সাইকেলরিকশা ভাড়া করে রাজবাড়ির কাছে আসেন। রিকশাওয়ালারা রাতবিরেতে রাজবাড়ি এলাকায় আসতে চায় না। কিন্তু ডবল ভাড়ার লোভে এক রিকশাওয়ালা এসেছিল। সাততাড়াতাড়ি ভাড়া নিয়ে সে কেটে পড়েছিল। সে সাবধান করে দিয়েছিল, ডমরুপাহাড়ের সব ভূত নাকি রাজবাড়ির আনাচেকানাচে নেমে এসেছে।

এর পর হালদারমশাই রাজবাড়ির ভেতরে ঢোকেন। এই রাস্তাটা রাত্রে অন্ধকার ছিল। সাবধানে এগিয়ে শিবমন্দিরের কাছে পৌঁছে উনি আলো দেখতে পান। তখন মন্দিরের পেছনে গিয়ে দোতলা বাড়িটার দিকে লক্ষ্য রাখেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি কালো একটা জন্তুকে উল্টোদিক থেকে বাড়ির দক্ষিণ দিকে গুটিগুটি আসতে দেখেন। প্রথমে তিনি ওটাকে ভালুক ভেবেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ জন্তুটা দুই ঠ্যাঙে ভর করে দাঁড়ায় এবং মানুষের মতো হেঁটে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। তারপর অদ্ভুত নাকিস্বরে আঁহাঃ উঁহুঃ শব্দ করতে থাকে। চাপা গোঙানির মতো সেই শব্দ।

তারপরই দোতলা থেকে কেউ বন্দুকের গুলি ছোড়ে। হাঁকডাক শুরু হয়। রাঘব বল্লম আর টর্চ হাতে বেরিয়ে আসে। অমনি কালো বিদঘুটে জন্তুটা ওদিকে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে যায় হালদারমশাই ওটাকে কোনও জন্তু বলেই ধরে নেন। তাই রিভলভার তাক করে আরও ঘন্টা দুই বসে থাকেন। জন্তুটা আবার এলে তিনি ছুটে গিয়ে গুলি করে মারবেন। কিন্তু আর ওটা আসেনি। তা ছাড়া ততক্ষণে এই পাহাড়ি এলাকায় বেশ হিম পড়ছিল। সেই সঙ্গে ঘন কুয়াশাও জমছিল। অগত্যা তিনি হোটেলে ফিরে যান।

কাল সকালে হালদারমশাই লেকের ধারে ঘুরতে বেরিয়েছিনে। স্থানীয় লোকেরা অবশ্য ঝিল বলে। ঝিলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ডমরুপাহাড়ের নিচে পুরনো একটা শ্মশান আছে। এখন আর ওখানে মড়া পোড়ানো হয় না। আদ্যিকালে ওখানে একটা মন্দির ছিল। তার ধ্বংসাবশেষের ওপর প্রকাণ্ড বটগাছ আছে। সেখান থেকে রাজবাড়ির ওপর নজর রাখার সুবিধে হয়। তাই হালদারমশাই ঠিক করেন, শ্মশানতলায় সাধুবাবা সেজে বসে থাকবেন।

হোটেলে ফিরে দুপুরের খাওয়া সেরে হালদারমশাই শ্মশানতলায় চলে যান। ঝোপের আড়ালে সাধুবাবা সেজে গিয়ে বটতলায় একটা পাথরের ওপর বসে থাকেন। শুকনো কাঠ কুড়িয়ে ধুনি জ্বালানোর অসুবিধে হয়নি। গাঁজার লোভে একজন-দুজন করে গাঁজাখোর জুটেছিল। কিন্তু সাধুবাবর ধ্যানভঙ্গ হচ্ছে না, বা গাঁজার কোনও আয়োজন না দেখে তারা চলে যায়।

বুদ্ধি করে সঙ্গে চাপাটি আর আলুরদম নিয়ে গিয়েছিলেন হালদারমশাই। রাতের খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়েন। গত রাতে তিনি যে দিক থেকে জন্তুটা এসেছিল, সেদিকে এগিয়ে রাজবাড়ির ভাঙা পাঁচিলের আড়ালে ওত পেতে বসেন। কিন্তু আশ্চর্য, কালো বিদঘুটে জন্তুটা যেন টের পেয়েছিল। এ রাতে তাকে শিবমন্দিরের দিক থেকে আসতে দেখা যায়। তারপর সেই একই ঘটনা। জন্তুটা শিবমন্দিরের দিকে পালিয়ে যায়। কোনও সাধুসন্ন্যাসী রিভলভার হাতে তাকে তাড়া করেছেন দেখে কী প্রতিক্রিয়া হবে—হয়ত হিতে বিপরীত হয়ে যাবে, এই ভেবে হালদারমশাই সেখান থেকে কেটে পড়েন। তাঁর পুলিশজীবনে যেখানে-সেখানে বসে বা শুয়ে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা ছিল। কাজেই শ্মশানতলায় রাত কাটাতে অসুবিধে হয়নি। ধুনিটা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। ধুনির তাপে হিম জব্দ হয়েছিল।

তাঁর বিশ্বাস জন্তুটা রাজবাড়ির কোনও ধ্বংসস্তুপে, গুহা বা গর্তের মধ্যে বাস করে। তাই আজ সকালে আনাচে-কানাচে খুঁজতে এসেছিলেন। কিন্তু কুমারসায়েবের চোখে পড়ে যাওয়ায় বেকায়দায় পড়েছিলেন। খামোকা ঝামেলা বাধিয়ে লাভ কী? ঝোপঝাড় পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে তিনি আবার শ্মশানতলায় চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তারপর হঠাৎ কোথা থেকে ঢিল পড়তে শুরু করল। তর্জনগর্জন শাপমন্যি করেও লাভ হল না। উপরন্তু একটা বড় পাথরের টুকরো এসে পড়ল। একটুর জন্য বেঁচে গেলেন। তারপর পড়ি-কি-মরি করে পালিয়ে এসেছেন।...

কর্নেল বললেন, তাহলে আপনার ব্রেকফাস্ট হয়নি এখনও। চলুন। আগে কিছু খেয়ে নেবেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সহাস্যে বললেন, —একডজন বিস্কুট খাইছি। বোতলে জল ছিল। খাইছি।

কথা বলতে বলতে আমরা রাজবাড়ির খণ্ডহর পেরিয়ে নিচের রাস্তায় পৌঁছুলুম। কর্নেল বললেন, —আপনার ওপর অনেক ধকল গেছে হালদারমশাই! আপনি হোটেলে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে জিরিয়ে নিন। তারপর চারটে নাগাদ রাজবাড়িতে আসবেন।

—কিন্তু এখন আপনারা যান কোথায়?

—ডমরুপাহাড়ে অর্কিড খুঁজতে যাচ্ছি।

–রাজবাড়ির পেছনেই তো ডমরুপাহাড়। উল্টোদিকে আইলেন ক্যান?

–ওদিক থেকে পাহাড়ে ওঠা যায় না। আপনি হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম নিন। হালদারমশাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থাকার পর হনহন করে এগিয়ে গেলেন। তারপর একটা সাইকেলরিকশা দাঁড় করিয়ে একলাফে উঠে বসলেন।

বললাম, —সত্যিই পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন—নাহ। কুমারসায়েবের ভাগ্নের বাড়ি যাচ্ছি। দেখি, ভাগ্নেবাবাজি এ বিষয়ে কী বলেন?

-ব্যাটম্যান বিষয়ে?

তুমিও হালদারমশাইয়ের মতো ব্যাটম্যান বলছ?-কর্নেল বাঁদিকের রাস্তায় পা বাড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে। ব্যাটম্যান বলতে আমারও আপত্তি নেই। অন্তত যতক্ষণ না তার চাক্ষুষ দর্শন পাচ্ছি। তবে ব্যাটম্যানের ডানা থাকা দরকার।

এই রাস্তাটা রাজবাড়ির সমান্তরালে এগিয়ে গেছে। টানা পাঁচিলঘেরা একটা করে বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। পুরনো আমলের বাগানবাড়ির মতো দেখতে। কয়েকটা বাড়ির পর একটা বাড়ির গেটে গিয়ে কর্নেল ডাকলেন, —মিঃ মজুমদার আছেন নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া এল—কে?

—এসেই দেখুন না আমি কে!

একটু পরে গেট খুলে গেল। একজন মধ্যবয়সি ভদ্রলোক, পরনে প্যান্ট, স্পোর্টিং গেঞ্জি, হাত বাড়িয়ে কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, -এসে গেছেন তাহলে? আসুন ভেতরে আসুন।

লনের শেষে পোর্টিকোর তলায় একটা গাড়ি দেখলুম। কর্নেল বললেন, আপনি কখন এসেছেন?

কাল বিকেলে।—বলে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, ইনিই কি সেই

—হ্যাঁ জয়ন্ত চৌধুরি। জয়ন্ত, ইনি মিঃ জয়গোপাল মজুমদার।

সাজানো গোছানো সুদৃশ্য ড্রয়িং রুমে আমাদের বসিয়ে জয়গোপাল বললেন, —কেয়ারটেকার গোবিন্দকে বাজারে পাঠিয়েছি। এখনই ফিরে আসবে। তারপর আপনার কফি।

–ধন্যবাদ মিঃ মজুমদার!

—মামার খবর কী বলুন?

—একই কথা ওঁর। আপনিই নাকি তার পেছনে ভূত লেলিয়ে দিয়েছেন।

জয়গোপাল গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, —মামাও যে আমার পেছনে ভূত লেলিয়ে দিয়েছেন কর্নেলসায়েব।

-একটু খুলে বলুন!

–কাল রাতে আমার বাড়ির পেছনে ভূতের কান্না শুনেছি।

—আহাঃ উহুঃ?

জয়গোপাল নড়ে বসলেন, হ্যাঁ। টর্চ জেলে আমি আর গোবিন্দ বাড়ির চারদিক তন্ন তন্ন খুঁজেছি। তারপর যেই আবার শুয়ে পড়েছি, আবার সেই একই উৎপাত।

-বলেন কী! আপনার মামাবাড়িতেও একই ঘটনা।

—গোবিন্দ এক পলকের জন্য নাকি দেখেছে, কালো কুচকুচে একটা জন্তু পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বলনে, আপনার মামাতো বোন রাণু এসেছে।

-তাই বুঝি? জামাইবাবু আসেনি?

—না। আচ্ছা মিঃ মজুমদার, আপনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন। গন্ধর্বমূর্তির কথা। জয়গোপাল জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন, -হ্যাঁ। মায়ের কাছে শোনা কথা। রাজবাড়িতে নাকি দুটো গন্ধর্বমূর্তি ছিল। যুগ্মবিগ্রহ বলতে পারেন। দামি ধাতুর তৈরি। মায়ের ছোটবেলায় রাজবাড়ির তখন খুব দাপট। বাড়ির কুমারী মেয়েরা গন্ধর্বপুজো করত। এখন তো রাজবংশের কে কোথায় কেটে পড়েছে। মামা একা খণ্ডহর পাহারা দিচ্ছেন যখের মতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মামা জানেন কোথায় সেই যুগ্মবিগ্রহ লুকানো আছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, -রহস্যটা তা হলে কিছুটা ফাঁস হল।

–তার মানে?

—মিঃ মজুমদার! আপনি এবং কুমারসায়েব ছাড়া তৃতীয় কোনও লোক ওই বিগ্রহের কথা জানে। কিন্তু সে এখনও জানে না, বিগ্রহ আপনার মামার কাছে আছে, নাকি আপনার মা ওটা আপনাকে গোপনে দিয়ে গেছেন। তাই কুমার সায়েব এবং আপনার প্রতিক্রিয়া বুঝতেই এই ভূতুড়ে কাণ্ড করছে। তার ধারণা আপনাদের দুজনের মধ্যে যাঁর ওই বিগ্রহ থাকবে, তিনিই ভয় পেয়ে ওটা ফেলে দেবেন এবং সে তা কুড়িয়ে নিয়ে পালাবে।

জয়গোপাল মাথা নেড়ে বললেন, মা আমাকে কোনও গন্ধর্ব মূর্তি দিয়ে যাননি। বিশ্বাস করুন। কিন্তু সে যাই হোক, আহা কেন?

—মিঃ মজুমদার! আহাঃ উহুঃ নয়। কথাটা হল হাহা হুহু। রামায়ণে হাহা হুহু নামে দুই গন্ধর্বের কথা আছে। এই যুগ্মবিগ্রহ তাদেরই। আচ্ছা, চলি।

জয়গোপাল হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।...

চার| কুমারসায়েবের মেয়ে রাণুকে আমার দাম্ভিক প্রকৃতির বলে মনে হয়েছিল। কুমারসায়েব আমাদের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে নেহাত সৌজন্যমূলক নমস্কার এবং কথাবর্তা বলে। চলে গিয়েছিল। পরে কুমারসায়েব কৈফিয়ত দিয়েছিলেন, -রাণুর মনমেজাজ ভাল নেই। কারণ আমি ওর কথায় কান দিচ্ছি না। পিতৃপুরুষের এই ভিটে ছেড়ে আমি অন্য কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না।

খাওয়ার পর কুমারসায়েব বললেন, আপনারা বিশ্রাম নিন। আমিও একটু দিবানিদ্রার চেষ্টা করব।

কর্নেল বললেন, তার আগে আপনার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা আছে। চলুন, ও ঘরে বসে কথা হবে।

আমাদের থাকার ঘরে গিয়ে কুমারসায়েব একটা চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টে কর্নেলের দিকে তাকালেন।

কর্নেল বললেন, —গতবার এসে শিবমন্দিরের যে সেবায়েতকে দেখেছিলুম, তিনি এখনও আছেন কি?

কুমারসায়েব একটু অবাক হয়ে বললেন, —থাকবে না কেন?

পাঁচু ঠাকুর বংশানুক্রমে রাজবাড়ির সেবায়েত। রোজ ভোরবেলা এসে পুজোআচ্চা করে কলে যায়। ও থাকে বাঙালিটোলায়। তবে বয়স হয়েছে। ওর শরীরটা তত ভাল যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে এসে বলে ওর ছেলে নকুলকে বহাল করতে। কিন্তু নকুলের বদনাম শুনেছি। নেশাভাঙ করে। যাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তার হাড়-বজ্জাত বখাটে। রাঘবের কাছে শুনেছি, জয়গোপালের সঙ্গে নকুলের যোগাযোগ আছে।

কাজেই ওকে বহাল করার প্রশ্নই ওঠে না। ওর ভাই মুকুল অবশ্য ভাল ছেলে। কিন্তু সে পড়াশুনা করছে। পুজোআচ্চার কাজ তার পছন্দ নয়।

কর্নেল আস্তে বললেন, আপনার কাছে গন্ধর্ব মূর্তি আছে। যুগ্মবিগ্রহ। দামি ধাতুতে তৈরি। তাই না?

কুমারসায়েব চমকে উঠেছিলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ। আছে। কিন্তু হঠাৎ এ কথা কেন? তাছাড়া আপনি কোন সূত্রে জেনেছেন?

যেভাবে হোক, জেনেছি। আপনি কি ওই মূর্তিদুটোর নাম জানেন? কুমারসায়েবকে বিব্রত দেখাচ্ছিল। মাথা নেড়ে বললেন, —নাম জানি না। তবে ওটা আছে।

-মূর্তিদুটি রামায়ণে বর্নিত হাহা-হুহু গন্ধর্বের। রাতবিরেতে আপনি যে ভূতুড়ে আহাঃ উহুঃ শোনেন, তা আসলে হাহা-হুহু।

কুমারসায়েব কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

-খুব সোজা অঙ্ক কুমারসায়েব! কেউ হাহা-হুহু গন্ধর্ব বিগ্রহের কথা জানে। তাই সে ভেবেছে রাতবিরেতে নামদুটো ভূতুড়ে গলায় উচ্চারণ করলে আপনি ভয় পাবেন এবং ভাববেন, স্বয়ং দুই গন্ধর্বের আত্মা এসে মূর্তি ফেরত চাইছে তখন মূর্তিদুটি তাদের উদেশে ছুড়ে ফেলে নিষ্কৃতি চাইবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আপন গন্ধর্বমূর্তির নাম জানেন না।

কুমারসায়েব ফুঁসে উঠলেন, এ তাহলে জয়গোপালেরই বদমাইশি!

কর্নেল হাসলেন, না কুমারসায়েব। জয়গোপালবাবুর বাড়িতেও এবার একই কাণ্ড শুরু হয়েছে।

—কে বলল আপনাকে?

—আমি দুপুরে ওঁর কাছে গিয়েছিলুম।

—ও মিথ্যুক!

কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, —জয়গোপালবাবুও যে মূর্তিদুটির নাম জানেন না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। যাই হোক, আপনি এখনই গিয়ে দেখে আসুন, গন্ধর্বমূর্তি যথাস্থানে আছে কি না।

কুমারসায়েব বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন, তুমি কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতে পার জয়ন্ত। হালদারমশাই এলে আমরা বেরুব।

বলে উনি দক্ষিণের জানালার কাছে গিয়ে বাইনোকুলারে লেক বা ঝিলটা দেখতে থাকলেন। একটু পরে কুমারসায়েব ফিরে এসে ধপাস করে বসে বলেন, আশ্চর্য ব্যাপার কর্নেলসায়েব! বিগ্রহ উধাও।

কর্নেল বললেন, কোথায় রেখেছিলেন?

—আমার ঘরে রাণুর মায়ের একটা প্রকাণ্ড ছবি টাঙানো আছে। তার পেছনের কুলুঙ্গিতে ওটা লুকোনো ছিল। কাউকে জানতে দিইনি! রাণুকে পর্যন্ত না।

ঠিক আছে। এ নিয়ে আপনার চিন্তার কারণ নেই।-বলে কর্নেল বললেন, বিগ্রহের কথা আপাতত ভুলে যান। গতবার এসে ঝিলে ছিপ ফেলে মাছ ধরেছিলুম। আপনারও ছিপ ফেলার অভ্যাস ছিল। এখন নেই?

কুমারসায়েবকে উদ্রান্ত দেখাচ্ছিল। অন্যমনস্কভাবে বললেন, আছে। আপনি ছিপ ফেলতে চাইলে অসুবিধে নেই। রাঘবকে চার তৈরি করতে বলছি। কিন্তু এ কী সর্বনাশ হল দেখুন!

—আপনি রাণুকে জিজ্ঞেস করেছেন কিছু?

-নাহ্। রাণু ওর ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে। ওর এই অভ্যাস। এখানে এলেই—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, ঠিক আছে। আপনি রাঘবকে চার তৈরি করে ঠিক জায়গায় ফেলতে বলুন। ছিপ টোপ সবকিছু যেন তৈরি রাখে। আমি একটু জিরিয়ে নিয়ে ঘাটে যাব। আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে। আশা করি বিগ্রহ উদ্ধার করতে পারব।

কুমারসায়েব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে এসেছিল। কতক্ষণ পরে কর্নেলের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। কর্নেল বললেন, উঠে পড় জয়ন্ত! তুমি-আমি পালাক্রমে ছিপ নিয়ে বসব। ঝিলের জলে মাছ আছে ঠিকই। তবে খুব ধূর্ত ওরা। দেখা যাক।

ঘড়ি দেখলুম। সাড়ে তিনটে বাজে। ঝিলের উত্তর-পশ্চিম কোণে রাজবাড়ির সানবাঁধানো ঘাট। টুটাফাটা হয়ে আছে। রাঘব ছিপ আর টোপ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কর্নেল তাকে বললেন, তুমি একটু লক্ষ্য রাখবে রাঘব। এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। এলে তাকে এখানে নিয়ে আসবে।

রাঘব চলে গেল। কর্নেল ছিপ ফেলে বাইনোকুলারে দূরে কী দেখতে থাকলেন। জিজ্ঞেস করলুম—কোনও বিরল প্রজাতির পাখি খুঁজছেন নাকি?

-নাহ্। শ্মশানতলা দেখছি।

—শ্মশানতলায় সন্দেহজনক কিছু ঘটছে বুঝি?

-হ্যাঁ। হালদারমশাই রিভলবার খুলে কাকে তাড়া করে এদিকেই আসছেন।

—সে কী! কাকে তাড়া করছেন উনি?

—তাকে দেখতে পাচ্ছি না। ওদিকটায় ঘন জঙ্গল। শুধু হালদারমশাইকে দেখতে পাচ্ছি।

পাহাড়ের নিচে বলে এখনই ওদিকে ছায়া ঘন হয়েছে। খালি চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এদিকে কর্নেল ঘাটের নিচের ধাপে গুড়ি মেরে নেমে গেলেন। লক্ষ্য করলুম, শেষ ধাপের বাঁদিকে জলের তলায় গুঁজে রাখা একটা ডাল ইঞ্চি ছয়েক উঁচু হয়ে আছে। ঢেউয়ে ওটা বারবার ডুবে যাচ্ছে আর মাথা তুলছে। কর্নেল ডালটা উপড়ে তুললে দেখলুম, ওতে একটা নাইলনের দড়ি বাঁধা আছে। দড়িটা টানতে থাকলেন কর্নেল।

একটু পরে অবাক হয়ে দেখলুম দড়ির শেষ প্রান্তে ইঞ্চি ছয়েক উঁচু এবং ইঞ্চি চারেক চওড়া হলদে রঙের ধাতব প্লেটে সাঁটা দুটো কারুকার্যচিত মূর্তি। কর্নেল দ্রুত ওটা রুমালে জড়িয়ে জ্যাকেটের ভেতর পকেটে চালান করলেন। তারপর ঘাটের পাশে ভেঙেপড়া একটুকরো পাথর সেই দড়িতে বেঁধে জলে ছুড়ে ফেললেন এবং সেই ডালে আগের মতো দড়িটা বেঁধে ঠিক জায়গায় পুঁতে দিলেন।

ওটা যে সেই গন্ধবিগ্রহ তা বুঝতে পেরেছিলুম। ঘাটটা খুব নিচুতে। তাছাড়া পাঁচিল থাকায় পেছন থেকে কারও এ ব্যাপারটা চোখে পড়ার কথা নয়।

কর্নেল উঠে এসে ছিপ হাতে নিয়ে হাসলেন, এটাই অনুমান করেছিলুম। এবার দেখা যাক, হালদারমশাই কী করেন।

একটু পরে ঘাটের ডানদিকে ঝোপঝাড়ের ভেতর হালদারমশাইকে দেখা গেল। উনি সে ফেঁস ফোঁস শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন, বজ্জাতটা পলাইয়া গেল। শ্মশানতলায় কী একটা করছিল। আমি গেছি আর দৌড় দিছে। আমারে ঢিল ছুড়ছিল ওই ব্যাটাই।

কর্নেল বাইনোকুলারটা একহাতে তুলে ফের শ্মশানতলা দেখতে দেখতে বললেন, সে আবার শ্মশানতলায় গিয়ে একটা কিছু করছে হালদারমশাই! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু থাক—আপনি আর ওর কাজে বাগড়া দেবেন না। এখানে বসুন। আশা করছি, রাঘব কফি নিয়ে আসবে। ঘাটে বসে কফি খাবার চেয়ে আনন্দ আর কিসে আছে?

ঝিলের মাছগুলো মহা ধূর্ত, টোপ খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বঁড়শিতে, বেঁধানোর সুযোগ দিচ্ছে না। হালদারমশাই ঘাটের ধাপের পাশে বসে শ্মশানতলার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন। কর্নেলের বাইনোকুলারের মহিমা সম্ভবত এতদিনে বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু কর্নেলের দুহাতে ছিপ এবং একাগ্র দৃষ্টি ফাতনার দিকে। তাই হালদারমশাই বাইনোকুলার চাওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। কতবার তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছি, —আপনিও একটা বাইনোকুলার কিনে ফেলুন হালদারমশাই! গোয়েন্দগিরিতে খুব কাজে লাগবে। তিনি বলেছিন, ধুর! ধুর! ওই যন্তর কী কাজে লাগবে? ক্রিমিন্যালরা কি পক্ষী?

কিছুক্ষণ পরে রাঘব এল কফির পট আর পেয়ালা নিয়ে। হালদারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে সে নমস্কার করে বলল, সারকে কোথায় যেন দেখেছি?

কর্নেল বললেন, হালদারমশাইকে কলকাতায় আমার ঘরে দেখেছিলে। তোমাকে ওঁর আসবার কথাই তখন বলেছিলুম। তুমি ওঁর জন্য আর একটা পেয়ালা আন।

রাঘব যাচ্ছিল। কর্নেল তাকে পিছু ডেকে ফের বললেন, কুমারসায়েব কী করছেন রাঘব?।

কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। আবার বাবা-মেয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি হচ্ছে। বলে রাঘব চলে গেল।

চাপা গলায় বললুম, কর্নেল! আমার মনে হচ্ছে, বাবা-মেয়ের মধ্যে তর্কাতর্কিটা আসলে গন্ধর্ববিগ্রহ নিয়েই। তাই না।

হালদারমশাই নড়ে বললেন—কী কইলেন? কী কইলেন?

কর্নেল বললেন, পরে সব বলব হালদারমশাই! তবে জয়ন্তের অনুমান ঠিক। গন্ধর্ববিগ্রহ তো এই রাজবংশের রীতি অনুসারে মেয়েদেরই প্রাপ্য। এতদিনে রাণু বিগ্রহের খোঁজ পেয়ে স্নানের ছলে ঝিলের জলে লুকিয়ে রাখতে এসেছিল। আমার এই যন্ত্রটি দূরকে নিকট করে। তখন শিবমন্দিরের কাছ থেকে পাঁচিলের ভাঙা অংশ দিয়ে এই ঘাটটা দেখতে পাচ্ছিলুম। আসলে একটা কৌতূহল ছিল। রাণু কলকাতায় থাকে। ঝিলের জলে স্নানের বয়স তার পেরিয়ে গেছে। যাই হোক, লক্ষ্য করলুম নাইলনের দড়ি নিয়ে এখানে সে কিছু করেছে। তাই ছিপ ফেলার প্ল্যান করেছিলুম।...

পাঁচ | দিনের আলো দ্রুত কমে যাচ্ছিল। অবশেষে কর্নেল ছিপ গুটিয়ে ফেললেন। ঘাটের ওপর দিকে পাঁচিল কবে মুখ থুবড়ে পড়েছে। দুধারে ঝোপঝাড় গজিয়েছে। আমরা রাজবাড়িতে ঢুকলাম। সেই সময় কুমারসায়েবের মেয়ে রাণু আমাদের পাশ কাটিয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। কোনও কথা বলল না। মেয়েটা দাম্ভিক, নাকি মাথায় ছিট আছে?

কর্নেল ঘুরে তাকে একবার দেখে নিয়ে চুপচাপ পা বাড়ালেন। হালদারমশাই চাপা স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে গেল জয়ন্তবাবু?

একটু হেসে বললুম, —রাজকন্যা।

অ্যাঁঃ? কন কী? বলেই হালদারমশাই ধাতস্থ হলেন। কুমারসায়েবের ডটার! কিন্তু এই সন্ধেবেলা একা ঘাটে গেল ক্যান?

খোলা বারান্দায় কুমারবাহাদুর একা বসেছিলেন। এতক্ষণে আলো জ্বলে উঠল। আমাদের দেখে তিনি হাঁক দিলেন, রাঘব! চেয়ার নিয়ে এস।

কর্নেল বললেন, আমরা ঘরেই বসব কুমারসায়েব।

ঘরে ঢুকে কর্নেল কুমারসায়েবের সঙ্গে হালদারমশাইয়ের আলাপ করিয়ে দিলেন। কুমারসায়েব বললেন, রাঘব এঁর কথা বলছিল। ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ? ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো?

কর্নেল বললেন, অনেকক্ষেত্রে আমি এঁর সাহায্য নিয়ে থাকি। ইনি রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে ছিলেন।

বাহ্! খুব ভাল!—কুমারসায়েব খুশি হয়ে ফের ডাকলেন, রাখব! কফি-টফি নিয়ে এস।

ঝিলের জলের মাছ নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর কর্নেল হঠাৎ বললেন, এক মিনিট! আমি আসছি। আপনারা গল্প করুন।

কর্নেল বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরে রাঘব কফি আনল। সেই সময় মেয়েলি গলার আর্ত চিৎকার শোনা গেল, রাঘবদা! রাঘবদা!

রাঘব দৌড়ে গেল। হালদারমশাইও একলাফে বারান্দার নিচে গিয়ে পড়লেন। তারপর উধাও হয়ে গেলেন। আমিও বেরিয়ে গেলুম। কুমারসায়েব বারান্দায় বেরিয়ে কী হয়েছে, কী হয়েছে বলে হাঁকডাক জুড়ে দিলেন। মাত্র দু-তিন সেকেন্ডের ব্যাপার।

ঘাটের দিকে ছুটে যাওয়ার সময় হালদারমশাইয়ের গলা শুনতে পেলুম, —তবে রে হালার বান্দর!

তারপর ঝিলের জলে অদ্ভুত সব শব্দ।

কর্নেল ঘাটের ধাপ থেকে রাণুকে টেনে তুললেন। আবছা আলোয় দেখলুম, হালদারমশই জলে একটা কালো জন্তুকে বগলদাবা করে ফেলেছেন এবং তার একহাতে রিভলভার জলের ওপর নাচানাচি করছে। রাঘব ঝটপট জলে নেমে গিয়ে জন্তুটাকে কাবু করে ফেলল। হালদারমশাই আর রাঘব ওটাকে টেনে ঘাটের ধারে ওঠাল।

ইতিমধ্যে গদাই আর চামেলী এসে গেছে। চামেলী রাণুকে ধরে নিয়ে গেল। রাণু যুঁপিয়ে কঁদছিল।

কদাকার জন্তুটাকে হালদারমশাই আর রাঘব শূন্যে তুলে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। কুমারবাহাদুর বোবাধরা গলায় বলে উঠলেন, কী ওটা কী?

কর্নেল বললেন, এই সেই ভূত কুমারসায়েব! রাঘব! হালদারমশাই! ভূতটাকে এবার দুঠ্যাঙে দাঁড় করিয়ে দিন।

ভূতটাকে দাঁড় করানো গেল না। সে হাত-পা ছুড়তে শুরু করল। কর্নেল ওটার দুই কান ধরে টান দিতেই চামড়া খুলে যাওয়ার ব্যাপার হল। বেরিয়ে পড়ল একটা মানুষের মাথা। তারপর পিঠের অংশ খুলে ফেললেন কর্নেল। কী অবাক! পিঠের দিকে জিপ আঁটা ছিল। এবার বেরিয়ে

পড়ল হাফপ্যান্টপরা একটা রোগা লিকলিকে লোক।

কুমারসায়েব বলে উঠলেন, এ কী! এ যে দেখছি নকুল! পাঁচু ঠাকুরের গুণধর পুত্র! অ্যাই হারামজাদা ভূত! তোমার হাড়ে হাড়ে এত বুদ্ধি?..

নকুল হাঁউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল কর্নেল বললেন, আমার যেতে আর একটু দেরি হলেই রাণুকে শয়তানটা মেরে ফেলত। রাণুর মাথায় আঘাত করার জন্য একটা বেঁটে কাঠের টুকরো তুলেছিল। ওটা ঘাটে পড়ে আছে। রাঘব! তুমি থানায় গিয়ে পুলিশকে খবর দাও। গদাই! একটা দড়ি এনে একে বেঁধে রাখো।

গদাই দড়ি নিয়ে এল। হালদারমশাই পুলিশি কায়দায় নকুলকে পিঠমোড়া করে বেঁধে টানতে

টানতে বারান্দায় ওঠালেন।

কুমারসায়েব বললেন, নকুল হারামজাদা রাণুকে মারতে গেল কেন? কিছু তো বুঝতে পারছি না।

কর্নেল বললেন, ঘরে চলুন। কফি খেতে খেতে সব বলছি।

হালদার মশাই বললেন—আমি আসামিরে পাহারা দিচ্ছি। একখান চেয়ার চাই। চেয়ারে বসে কফি খাব আর পাহারা দেব।

গদাই তাঁকে একটা চেয়ার এনে দিল। তারপর একপেয়ালা কফি দিয়ে এল। হালদারমশাই পুলিশি কায়দায় আসামিকে উপুড় করে দিয়ে তার পিঠে জলে ভেজা দুই পা চাপিয়ে রাখলেন। তার প্যান্টশার্টও ভেজা। কিন্তু গ্রাহ্য করলেন না। এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে কফির পেয়ালা।

কর্নেল বললেন—রাণু আজ গন্ধর্বমূর্তি চুরি করে ঝিলের জলে ডুবিয়ে রেখেছিল। তার দোষ নেই। প্রথমত, আপনাদের বংশের রীতি অনুসারে এ বিগ্রহ বাড়ির মেয়েদেরই পূজ্য। দ্বিতীয়ত, রাণু বুঝতে পেরেছিল, কেউ বা কারা ওটার জন্যই আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে। ভয় পেয়ে আপনি যদি দৈবাৎ বিগ্রহ কোথাও ফেলে দেন, এমন আশঙ্কাও অমূলক ছিল না।

যাই হোক, ব্যাপারটা দৈবাৎ আমার চোখে পড়ে যায়। ছিপে মাছ ধরার ছলে ঘাটে গিয়ে মূর্তিটা খুঁজে বের করেছিলুম। এই নিন সেই বিগ্রহ। এই যুগ্ম গন্ধর্ব আর পেছনকার প্লেট নিরেট সোনার বলে মনে হচ্ছে।

কুমারসায়েব হাত বাড়িয়ে বিগ্রহ নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, নিরেট সোনা।

-নকুল নিশ্চয় কোথাও ওত পেতে ছিল। রাণু জলে কিছু লুকিয়ে রাখছে এটা ওর চোখে পড়েছিল। কিন্তু দিনের বেলা ঘাটের দিকে আসতে সাহস পায়নি। এদিকে ঘাট থেকে আমরা উঠে আসার পর রাণু গিয়েছিল। আমি বিগ্রহের বদলে দড়িতে একটুকরো পাথর বেঁধে জলে ডুবিয়ে রেখেছিলাম। রাণু সেটা টেনে তুলে নিশ্চয় হতবাক হয়ে বসেছিল। সেই সময় মওকা বুঝে শ্রীমান নকুল গিয়ে হানা দেয়। রাণু অবশ্য ভূত দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিল। আমি গিয়ে দেখি, বজ্জাতটা একটা কাঠ তুলে ওকে মারতে যাচ্ছে। আমি ওকে ধরে ফেলার আগেই হালদারমশাই ওর ওপর ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। ফলে দুজনেই জলে পড়ে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

কর্নেল হেসে উঠলেন।

বাইরে থেকে হালদারমশাই বললেন, বান্দরটা আমারে শ্মশান থেকে তাড়াইয়া দিছিল ক্যান?... এই ভূত! ক্যান ঢিল ছুড়ছিলি?

কর্নেল বললেন, ওখানে ওর এই ভূতের পোশাক লুকোনো থাকত। কাজেই আপনাকে তাড়ানোর দরকার ছিল ওর। বিকেলে সে পোশাকটা অন্য নিরাপদ জায়গায় রাখতে গিয়েছিল। আপনি গিয়ে না পড়লে কী সাংঘাতিক কাণ্ড হত!

বারান্দা থেকে নকুল চি চি করে বলল, আর কক্ষনও এমন হবে না কুমারসায়েব!

কুমারসায়েব লাঠি তুলে গর্জন করলেন, শার্ট আপ ভূত কোথাকার!

তারপর ভেতরে চলে গেলেন।

হালদারমশাই!-কর্নেল বারান্দায় গেলেন। আপনি এক কাজ করুন। জয়ন্তের পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ভেজা প্যান্টশার্ট ছেড়ে ফেলুন। ঠাণ্ডায় কতক্ষণ বসে থাকবেন? পুলিশ আসতে একটু দেরি হবে। থানা প্রায় দু-কিলোমিটার দূরে।

আসামিকে কর্নেলের জিম্মায় রেখে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ঘরে ঢুকলেন। করুণ হেসে বললেন, বড় হিম জয়ন্তবাবু!.....

** সমাপ্ত**